SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গের দর্শনে বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয়

Gita Rani Jana

১

ভূমিকা

যেকোন ধর্মসম্প্রদায়ের আলোচনার মধ্যে দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়, একটি হল আচরণ বা ক্রিয়া সংক্রান্ত এবং অপরটি দার্শনিক তত্ত্ব সংক্রান্ত। এই আচরণ বা ক্রিয়াকে আবার তিনভাগে দেখা হয়ে থাকে, বাহ্য, আন্তর বা মানসিক এবং বাচিক। এই বাচিক, মানসিক এবং বাহ্য ক্রিয়াগুলি কোন অবস্থায় শুদ্ধ হয় বা ভালো হয় আর কোন অবস্থায় সেগুলি মন্দ হয় এই বিষয়ে ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধারণভাবে মতবিরোধ বিশেষ একটা দেখা যায় না। যে বিরোধ বা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় তা মূলতঃ দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতনও বৌদ্ধ দর্শনও এ বিষয়ে ব্যতিক্রমী নয়। অন্য সম্প্রদায়ের মত এখানে বাচিক ক্রিয়া, মানসিক ক্রিয়া এবং শারীরিক ক্রিয়া কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে তার ওপর প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতক, বিনয় ছাড়াও বিভিন্ন নিকায় গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা দেখতে পাই। কিন্তু দর্শনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আদর্শ পুরুষ কে হবেন বা জগতের মূল তত্ত্ব কি – এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই বুদ্ধের মতন বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যত্নবান সত্ত্বকে বা প্রাণীকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। সুতরাং বোধি বা বুদ্ধত্বের জন্য যে সত্ত্ব নিবেদিত, অর্থাৎ যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন; তিনিই বোধিসত্ত্ব[1]।

২

বোধিসত্ত্ব শব্দের ব্যুপত্তি

বোধিসত্ত্ব শব্দটি *বোধি* এবং *সত্ত্ব* এই শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। বোধিসত্ত্ব শব্দের অন্তর্ভুক্ত *সত্ত্ব* শব্দের অর্থ *ক্ষমতা, শক্তি, উৎসাহ, দক্ষতা, বীরত্ব* (strength, energy, vigour, power, courage)[2]। সুতরাং *বোধিসত্ত্ব* শব্দের অর্থ *এমন একজন যাঁর শক্তি এবং বীরত্ব বোধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়* (one whose energy and power is directed towards bodhi)।

তিব্বত কোষগ্রন্থ অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব-কে *byan-chub sems-dpah*[3] রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। *byan-chub*-র অর্থ *বোধি, sems*-র অর্থ *মন* বা *হৃদয়* এবং *dpah*-র অর্থ *নায়ক, শক্তিশালী জীব*। এই ব্যাখ্যায় সত্ত্ব শব্দ দুটি বিষয়কে নির্দেশ করে, তা হল মন এবং বীরত্ব। সম্পূর্ণ অর্থ হল সেই শক্তিশালী জীব বা নায়ক, যিনি মন বা হৃদয়ের দ্বারা বোধি অর্জন করেছেন। অর্থাৎ যিনি বোধিসত্ত্ব তিনি যেমন চারিত্রিকভাবে দৃঢ়, তেমনি

[১] প্রাচীন বৌদ্ধমত

2 Monier Williams, Sans Dicy, p-1052.

[3] Tibetan Dicy, Jaschke, 374b & 325b.

মানসিক ক্ষেত্রেও সবল; ফলে কোনরকম অশুদ্ধি তার চরিত্র বা চিত্তকে কলুষিত করতে পারে না। সুতরাং চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বুদ্ধিমত্তা – তিব্বতি ব্যাখ্যায় এই দুটি অর্থই সূচিত হয়েছে।

৩

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়

সুতরাং বোধিসত্ত্ব শব্দের বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন গ্রন্থে করা হলেও এক বিষয়ে সকলেই সহমত যে তাঁর চরিত্রের শুদ্ধতা বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ই কোন গ্রন্থে সংশয় প্রকাশ করেননি। আর মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ হলেন বোধিসত্ত্ব। এই মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা অসঙ্গের দর্শনে বোধিসত্ত্ব সংক্রান্ত যে আলোচনা দেখতে পাই, তাকেই অবলম্বন করে এই প্রবন্ধটি তুলে ধরবো।

৪

***বোধিসত্ত্ব* বিষয়ে অসঙ্গের অভিমত**

আর্য অসঙ্গ যোগাচার দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পুরুষপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[4]। অসঙ্গ মহিসাসক সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও সর্বাস্তীবাদীদের গ্রন্থের শিক্ষালাভও করেন। পরবর্তীকালে তিনি মহাযান সম্প্রদায়ে যুক্ত হন। তাঁর গুরু ছিলেন মৈত্রেয়নাথ। তাঁর গ্রন্থগুলি ছিল – *যোগাচারভূমি, অভিসময়ালংকার, অভিধর্মসমুচ্চয়, মহাযানসূত্রালংকার* এবং *মহাযানসংগ্রহ।*

অসঙ্গ তাঁর *মহাযানসূত্রালংকারে* বলেছেন, *বোধিসত্ত্বে-র বোধি* বলতে *আলোকসম্পাত* বা *চূড়ান্ত জ্ঞান,* আর *সত্ত্ব-র* অর্থ *নির্যাস*। অর্থাৎ *চূড়ান্তজ্ঞানের নির্যাস*। প্রজ্ঞাপারমিতা অনুযায়ী এর অর্থ হল এমন একজন যিনি যথার্থ জ্ঞানী বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অধিকারী। বোধিসত্ত্ব এমন একজন যাঁর মধ্যে চূড়ান্ত জ্ঞানের ক্ষমতা আছে, বা যিনি বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির অর্থাৎ চূড়ান্ত আলোকসম্পাতের পথে রয়েছে। বোধিসত্ত্বের লক্ষ্য শুধু নির্বাণ প্রাপ্তি নয়, বরং তিনি একটা বাস্তবায়িত কার্যে পরিণত এমন এক সত্তা, যে যথার্থভাবে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন। তাই বোধিসত্ত্ব একদিক থেকে *সাধক,* অন্যদিক থেকে *সিদ্ধ*। বোধিসত্ত্ব একজন ব্যক্তি কিন্তু মুক্ত। সে পৃথিবীর ওপর এক আলোকদীপ্ত আত্মা।

বোধিসত্ত্বের আদর্শ হীনযানীদের *অর্হত্ব* অর্থাৎ ব্যক্তিগত আলকদীপ্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কারণ বোধিসত্ত্ব আদর্শ বলতে সার্বিক বা সার্বজনীন আলোকসম্পাত। হীনযানীদের অর্হত্ব হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী অর্থাৎ এদের মতে, 'আলোকসম্পাত' – ব্যক্তির নিজের প্রাপ্ত বিষয়; যাতে সার্বিক বা সার্বজনীন বিষয় নেই। কিন্তু বোধিসত্ত্বের ধারণা হল – সার্বজনীন, যেখানে 'চূড়ান্ত বুদ্ধত্ব'; নিজের জন্য প্রাপ্ত হয় না বরং জগতের সমস্ত সংবেদনশীল সত্তার জন্য আকাঙ্খিত। তাই অর্হতের আদর্শ অহমিকাবাদী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যে নিজের মুক্তির কথা ভেবেই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। আর বিপরীতক্রমে বোধিসত্ত্ব হল পরার্থপর ভাবনা, যাঁরা সকলের মঙ্গল নিয়ে চিন্তা করেন।

[4] *Bodhisattvabhūmi: Being the XVth Section of Asangpāda's Yogācārabhūmi, ed. By* Nalinaksha Dutt.

বোধিসত্ত্বের অর্থ মানবতার উন্নতি, কারণ বোধিসত্ত্ব হল আলোকদীপ্ত এক স্বর্গীয় মানব। যাঁরা যেকোন মুহূর্তে নির্বাণ লাভ করতে পারে। অজ্ঞ, সাধারণ, অসমাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যারা দুঃখ কষ্ট ইত্যাদিতে ভুগছে তাদের ওপর অপার করুণা আর ভালোবাসার কারণে এবং তাদের উচ্চ 'বোধি' পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সবসময় চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে বিপদের সময় সঠিক পথ অনুমোদন করে ধীরে ধীরে স্বর্গীয় অবস্থার চূড়ান্ত পর্যায় অর্থাৎ নির্বাণে নিয়ে যাওয়াই বা 'বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি'র পথে পরিচালনা করাই বোধিসত্ত্বদের একমাত্র কাজ।

অসঙ্গ তাঁর *মহাযানসূত্রালংকার* গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এঁরা আত্মকেন্দ্রিকতা, রাগ, অহমিকাবোধ থেকে মুক্ত; কর্মে শুচিতা পালন করা এবং অপরের উন্নতি সাধনই এঁদের প্রধান কাজ। এঁদের হৃদয় ভালোবাসা, করুণাতে পূর্ণ। এঁরা নিজেদের সুখে সুখী নয়, এঁরা অপরের দুখঃমোচনে আগ্রহী ও এদের নিজেদের ইন্দ্রিয়ের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এঁরা ষড়পারমিতার অনুশীলন করেন। এঁরা বোধিসত্ত্ব কারণ পুদগলনৈরাত্ম, ধর্মনৈরাত্ম, আলয়বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। এঁরা সত্যজ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে এবং মানুষকে তিনটি স্বভাব অর্থাৎ পরিকল্পিত, পরতন্ত্র, পরিনিষ্পন্ন সম্পর্কে সচেতন করেন। বোধিসত্ত্ব ধর্মচক্রের প্রবর্তক হওয়ায় অন্যান্য ব্যক্তিকে যথাযথ জ্ঞান দান করে তাদের মধ্যস্থিত সমস্ত সন্দেহ ও অজ্ঞতা দূর করেন। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্যই সে বোধিসত্ত্ব। অর্থাৎ বুদ্ধপ্রদত্ত সত্যজ্ঞানকে উপলব্ধি করা এবং অন্যের মধ্যে তা বিস্তারিত করে সমস্ত সত্ত্বকে বোধি সম্বন্ধে অবহিত করে তোলাই তাঁদের কাজ।

বোধিসত্ত্বেরা অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষের দুখঃভোগ করাকে অন্যায় বা দোষযুক্ত হিসাবে দেখেন না। তিনি বরং তাদের কষ্ট, যন্ত্রনায় দুঃখিত হন এবং তাদের তা থেকে পরিত্রাণ দেবার চেষ্টা করেন। এঁদের বিশেষত্ব এখানেই যে, এঁরা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ করার মধ্য দিয়েই অসীম আনন্দ লাভ করে থকেন।

বোধিসত্ত্ব বলতে সমতার অবস্থা অর্থাৎ ভিন্ন সত্তার মধ্যে মিলন – যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বতা ও লুপ্ত হয়। একজন বোধিসত্ত্ব পরের জীবন ও হিতের জন্য বাঁচেন এবং তাদের দুঃখকে নিজের দুঃখ ভাবেন। বোধিসত্ত্বের অর্থ নিজেকে সার্বজনীন করার মধ্য দিয়ে অপরের জন্য বেঁচে থাকা। বোধিসত্ত্ব সমস্ত কিছু ভালোর প্রতীক, সার্বিক ভালোবাসা বা মহাকরুণার প্রতীক, বিশ্বভাতৃত্বের প্রতীক এবং শান্তি, শুদ্ধতা, আনন্দ ও উৎকর্ষেরও প্রতীক।

৫

শান্তিদেবের অভিমত

কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, যে বোধিসত্ত্বের গুণকীর্তনে সবাই রত কিংবা যার গুণের মাহাত্ম্য বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ই সংশয় প্রকাশ করেন না, সেই বোধিসত্ত্বের প্রকৃতি কেমন! আর বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতেই বা এই বোধিসত্ত্বের স্বরূপ কিভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্য্যাবতার* গ্রন্থে *বোধিসত্ত্ব* প্রসঙ্গে বলেছেন,

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

তেষাং শরীরাণি নমস্করোমি যত্রোদিতং তদ্বরচিত্ত-রত্নং।
যত্রাপকারোঽপি সুখানুবন্ধী সুখাকরাং স্তাং শরণং প্রযামি[5]।।

অর্থাৎ যাঁদের শরীরে সেই বরচিত্তরত্ন উদিত হয়েছে তাঁদের শরীরকে নমস্কার করি। অপকার করলেও (প্রিয়পুত্রকৃত অপকারের ন্যায়) যাঁদের সুখবাসনা হয়, সুখাকর সেই বোধিসত্ত্বদের আমি শরণাগত হই।

শান্তিদেব *বোধিসত্ত্বদের* আচরণীয় ধর্মপ্রসঙ্গে বলেছেন, বশীকৃতাত্মা হয়ে নিত্য স্থিতমুখ হবেন, অপ্রসন্নতার সূচক ভ্রূসংকোচ ত্যাগ করবেন, জগৎ-সুহৃৎ হবে এবং পূর্ব থেকেই লোককে স্বাগতাদি ভাষণ দিয়ে সন্তোষণশীল হবেন। সশব্দে পীঁড়ি আদি ফেলবেন না বা কপাটাদিতে আঘাত করে শব্দ করবেন না। নিঃশব্দপ্রিয় হবেন। বক, বিড়াল ও চোর যেরূপ নিঃশব্দে নিভৃতে সঞ্চরণ করে অভিমত অর্থ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্যোতি সর্বদা বিচরণ করবেন। পরানুশাসনে দক্ষ ও অপ্রার্থিতহিতৈষী হবেন। বিজ্ঞগণের বাক্য শিরোধার্য করবেন। সর্বদা সর্বশিষ্য হবেন অর্থাৎ সকলের নিকট যথাযোগ্য বিষয় শিক্ষা করবেন। কেউ পরগুণবর্দ্ধক কথা বললে সাধুকার দেবেন। পুণ্যকারীকে দেখলে স্তুতির দ্বারা উৎসাহিত করবেন। চক্ষুর দ্বারা যেন(পরমপ্রীতিতে) পান করছেন, এইরূপ অকুটিল দৃষ্টিতে সর্বদা প্রাণীদের দেখবেন। মনে করবেন যে, এদের আশ্রয় করেই আমার বুদ্ধত্ব হবে। বোধিসত্ত্বদের আচার অসংখ্যেয় বলে উদাহৃত হয়। সংক্ষেপতঃ চিত্তশোধনরূপ আচারই অবশ্য কার্য্য। এরূপ কিছু নেই, যা বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় নয়। সেইরূপ সেই সাধুবিহারী বোধিসত্ত্বদের উপার্জনীয় পুণ্যসম্ভারও অশেষ। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যাতে প্রাণীদের হিত এবং সুখ হয়, তাই-ই আচরণ করবেন, অন্য কিছু করবেন না। আর প্রাণীদের জন্য সমস্তই সম্যক্ সম্বোধিতে পরিণত করবেন।

৬

বোধিসত্ত্বে-র হেতুবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অসঙ্গ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিসত্ত্বদের নৈতিক চরিত্রের গুণ কীর্তনে ব্রতী হয়েছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থগুলিতে অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা, বিভিন্ন উপমার দ্বারা বোধিসত্ত্বদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। আমরা জানি যে, নীতিবিদ্যার বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলী নির্দেশিত হয়, যে নীতির অনুশীলনের দ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অতি সাধারণ মানুষও নিজেকে নিজ অবস্থা থেকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গও তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যেমন *মহাযানসূত্রালংকার, বোধিসত্ত্বভূমি* প্রভৃতি গ্রন্থে বোধিসত্ত্বদের বিভিন্ন নৈতিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। কিন্তু যখন তিনি বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় হেতুবিদ্যার আলোচনায় রত হলেন, তখন সেই আলোচনাতে তর্কবিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্বের যেমন মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন, তেমনই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাতে নৈতিকতার স্পষ্ট আভাসও দিয়ে গেছেন।

অসঙ্গ তাঁর *যোগাচারভূমি* গ্রন্থে-র *শ্রুতময়ীভূমিতে* বোধিসত্ত্বের শিক্ষণীয় বিদ্যাকে পাঁচপ্রকার বলেছেন – ১) অধ্যাত্মবিদ্যা – যেখানে বুদ্ধোক্ত সূত্র ,বিনয় এবং অভিধর্ম বিষয়ে আলোচনা, ২) চিকিৎসাবিদ্যা, ৩) হেতুবিদ্যা

[5] *বোধিচর্য্যাবতার*, ১।৩৬।

বা তর্কশাস্ত্র, ৪) শব্দবিদ্যা – যা থেকে ধর্ম ,অর্থ ,পুদগল ,কাল ,সংখ্যা এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মায়, এবং ৫) শিল্পবিদ্যা।

উপরিউক্ত পঞ্চ বিদ্যার মধ্যে অসঙ্গ বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের উল্লেখ করায় স্বভাবতই প্রশ্ন হবে যে একজন বোধিলাভের অনুগামী পুরুষের এই হেতুশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

অসঙ্গের মতে, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের জ্ঞানও থাকা আবশ্যক। কারণ আমরা জানি যে, হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে মূলতঃ যুক্তির উপর। তাই যুক্তি অবতারণার দ্বারাই হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের 'শাস্ত্রত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বৌদ্ধ দর্শনের এই 'শাস্ত্রত্ব'কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বোধিসত্ত্বগণ উপযুক্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন। কারণ বোধিসত্ত্বদের কাছে বুদ্ধবচনের অনুশীলন তথা রক্ষা করাই একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বুদ্ধবচন যাতে ভুল পথে নির্দেশিত না হয় তারজন্য তাঁদের যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে জ্ঞানের আলোকের দ্বারাই অন্যান্য ব্যক্তি যারা বুদ্ধবচনের ভুল অর্থকে জ্ঞাত হয়েছেন, সেই ভুল অর্থকে সংশোধন করবেন। এই সংশোধনের দ্বারাই বুদ্ধ দেসনার প্রতি অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ফলে বুদ্ধ বচনও রক্ষিত হবে এবং বোধিসত্ত্বের নিজের বিশ্বাসগুলোকে অন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাতে তথা যাঁরা বুদ্ধবচন সম্পর্কে অবহিত নন তাঁদের অবহিত করাতে সক্ষম হবেন। আর এইজন্যই যথাযথ যুক্তির জ্ঞান থাকা বোধিসত্ত্বদের একান্ত প্রয়োজন। এখানেই বৌদ্ধদর্শনে হেতুশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্রের উপযোগিতা।

আমরা জানি যে, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ হলেন বোধিসত্ত্ব, যে বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত জ্ঞানলাভ করবেন বা অনুশীলনে রত থাকবেন তার মধ্যে 'বাদ' তত্ত্বের শিক্ষাও গ্রহণ করবেন। আর এই বাদ হল হেতুশাস্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। কারণ বাদের শিক্ষা বোধিসত্ত্বের না থাকলে তিনি বুদ্ধ শিক্ষাকে রক্ষা করতে পারবেন না। বুদ্ধশিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বাদের শিক্ষাও একজন বোধিসত্ত্বের একান্ত প্রয়োজন বলে অসঙ্গ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অসঙ্গের দর্শনে বাদ হল সর্ব লোকের বচন (*বাদঃ সর্বলোকবচনম্*[6]) কিংবা 'বাদ' হল সব রকমের বাক্ ব্যবহার (*সর্বো বাগ্ ব্যবহারা*[7])। আসলে বাদ সর্বলোকের বচন না হলে একজন বোধিসত্ত্বের পক্ষে সমাজে সবার মধ্যে এই জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। তবে সর্বলোকের বচনকে কিন্তু বাদ বলা হলেও সেই বাদকে প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারণরূপে বলা যেতে পারে যে, সাধারণ মানুষ যাদের প্রমাণতত্ত্ব বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারাও তাদের জ্ঞানকে বা বক্তব্য বিষয়কে সত্য মিথ্যার নিরিখে যুক্তিপূর্বকই প্রতিষ্ঠা করেন। তাই কোন বোধিসত্ত্বের বুদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞান যে যথার্থ, তার নিশ্চয় করার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন; কারণ প্রমাণের দ্বারাই কোন জ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একইভাবে যদি বোধিসত্ত্বীয় জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে উপযোগী করা যায়, তাহলে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। প্রমাণের দ্বারা যদি কোন জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সেই জ্ঞান বিষয়ে কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকবে

[6] *অভিধর্মসমুচ্চয়* পৃঃ ১০৪

[7] *যোগাচারভূমি*

না। ফলে বোধিসত্ত্ব প্রদত্ত সেই জ্ঞানকে গ্রহণেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন সংশয় থাকবে না। সুতরাং এর ফলে বুদ্ধবচনের রক্ষণ তথা গ্রহণ হবে।

৭

বিভিন্ন জাগতিক জ্ঞানের অসারতা

তত্ত্বার্থ পটল হল *বোধিসত্ত্বভূমি*-র চতুর্থ অধ্যায় যা বৌদ্ধ দর্শনের প্রখ্যাত পন্ডিত এবং দার্শনিক অসঙ্গ রচনা করেন। *তত্ত্বার্থ পটলে*-র *তত্ত্ব*-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অসঙ্গ বিভিন্ন জগতের উল্লেখ করেছেন এবং *তত্ত্বার্থ* বলতে জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানের বা বিষয়ের নির্দেশ করেছেন।

তত্ত্বার্থ-পটলে জগৎ বা তত্ত্ব সংক্রান্ত জ্ঞানকে চারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে[৪] –

১) সাধারণ মানুষের কাছে যা সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে (লোকপ্রসিদ্ধ),

২) বুদ্ধি/যুক্তির উপর নির্ভর করে যা সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে (যুক্তিপ্রসিদ্ধ),

৩) এমন জ্ঞানীয় কর্মের (জ্ঞানগোচর) পরিমন্ডল যা সম্পূর্ণভাবে ক্লেশের আবরণ থেকে শুদ্ধ (ক্লেশাবরণ) (ক্লেশাবরণবিশুদ্ধিজ্ঞানগোচর),

৪) এমন জ্ঞানীয় কর্মের (জ্ঞানগোচর) পরিমন্ডল যা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানের আবরণ থেকে শুদ্ধ (জ্ঞেয়াবরণ) (জ্ঞেয়াবরণবিশুদ্ধিজ্ঞানগোচর)।

অসঙ্গ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের কথা বলেছেন যা জগতের চার প্রকারের ব্যক্তি এই জ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকেনঃ ক) সাধারণ মানুষ, খ) যুক্তিবিদ, গ) বৌদ্ধ হীনযান অনুশীলনকারী (শ্রাবক এবং প্রত্যেকবুদ্ধ) এবং ঘ) মহাযান অনুশীলনকারী (বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব)[৯]। অসঙ্গের এই চারপ্রকারের জ্ঞানীয় বিশ্লেষণের বর্ণনা পরবর্তী যোগাচারগণ যারা অসঙ্গের প্রধান আদর্শকে মেনে চলেন তারাও এই একই মতই অনুসরণ করেন।

লোকপ্রসিদ্ধ তত্ত্বের ব্যাখ্যাতে বলা যায় যে, এটি এই, অন্য কিছু নয়; অর্থাৎ এটি টেবিল, এটি ঘট, পট অন্য কোন বস্তু নয় – এই বস্তুটি যে টেবিল – এই নামটি পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। যদিও নৈয়ায়িক সম্প্রদায় এই স্থলে টেবিলত্ব ধর্ম আছে যে বস্তুর সেটিই টেবিল বলে ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায় সেই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। যেহেতু বৌদ্ধগণ সামান্য পদার্থ স্বীকার করেন না। অপোহ দিয়ে যা ধরা যায় তাই-ই বিকল্প। আমরা পরম্পরাগতভাবে টেবিলকে ঐ নামে জানি বলে এইভাবেই লোকপ্রসিদ্ধি চলে আসছে।

যুক্তিপ্রসিদ্ধ তত্ত্বের ব্যাখ্যাতে বলা যায়, যে কোন তত্ত্ব বা জ্ঞান মূলতঃ জাগতিক স্তরে যুক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ সংসারে জ্ঞানী মানুষ ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষও তাঁদের বক্তব্য বিষয়কে যুক্তি আকারেই উপস্থাপনা করেন। এমনকি যে কোন বক্তব্য বিষয়কে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের আলোকেই গ্রহণ বা বর্জন করেন। উল্লেখ্য আমাদের দার্শনিক জগতের বহুল প্রচলিত আলোচ্য বিষয় হল 'আত্মা আছে কি নেই' – এই

[৪] Janice Dean Wills, Page 70.

[৯] ঐ, p – 71.

বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বহু বাদানুবাদ থাকলেও সাধারণ মানুষও তাঁদের জ্ঞান অনুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন করেন। সুতরাং যুক্তিতে আমরা সবাই বিদ্ধ। আর এই যুক্তির প্রসিদ্ধি বিষয়ে আচার্য অসঙ্গ যে কতটা পারদর্শিতার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হল ক্লেশাবরণবিশুদ্ধিজ্ঞানগোচর। শ্রাবকযান বা প্রত্যেকবুদ্ধযানে এই ক্লেশাবরণ জ্ঞানের কথা বলেছেন। আমরা জানি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বা বিদ্বেষ বা অনুরাগ বা মোহ ইত্যাদি সর্বত্রই দুঃখ কষ্টের কারণ হয়। কোন বস্তুর প্রতি যে ভালো লাগা, এই অনুরাগ বা বিদ্বেষের সঙ্গে সর্বদা আত্মা বা আমি যুক্ত হয়ে আছে। এই অহং ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মমত্ব বোধ উৎপন্ন হয় এবং এই আমির সঙ্গে আকর্ষণ বিকর্ষনও উৎপন্ন হয়। তাই ভালো খারাপ সবই কেন্দ্রীভূত হয়ে এটাই অববোধ হয় যে আমি বলে বা আত্মা বলে কোন একটা স্থায়ী সত্তা আছে। যে সত্তা দেহ অতিরিক্ত সত্তা এবং যে আত্মারূপী সত্তাকে কেন্দ্র করে ভালো খারাপ ইত্যাদি তৈরী হয়। আর দেহ থেকে অতিরিক্ত যে আত্মার ধারণা তাকেই বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি। সৎকায়দৃষ্টির অন্তর্গত 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান', কায় মানে দেহ; সুতরাং এই শরীরে সৎরূপে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে আত্মা। অর্থাৎ আত্মা নামে একটা পদার্থ এই শরীরে আছে এই ধারণাই সৎকায়দৃষ্টি। তাই এই সৎকায়দৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের আমি বা আমার ধারণার উপর। সেই কারণে আত্মদৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয় আমাদের ক্লেশ অর্থাৎ অনুরাগ, রাগ ইত্যাদি।

আত্মদৃষ্টি বা সৎকায়দৃষ্টির প্রতিপক্ষ হল পুদগল নৈরাত্ম্য। তাই পুদগল নৈরাত্ম্যের জ্ঞান হলে সৎকায়দৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে যাবে সৎকায়দৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে গেলে অনুরাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদিও আর উৎপন্ন হতে পারবে না। ফলে সৎকায়দৃষ্টি বা আত্ম বিষয়ক দৃষ্টিকে পরিত্যাগ করার জন্য পুদগল নৈরাত্ম্যের বোধের প্রয়োজন। সুতরাং পুদগল নৈরাত্ম্যের দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি দূরীভূত হবে – সৎকায়দৃষ্টির দ্বারা আত্মদৃষ্টি দূর হবে – আত্মদৃষ্টির দ্বারা অনুরাগাদি ক্লেশেরও নাশ হবে। তাই বলা হয়েছে পুদগল নৈরাত্ম্যের বোধ হলে আমাদের সমস্ত ক্লেশের নাশ হয়। আর নির্বাণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই অনুরাগাদি ক্লেশসমূহ আবরণস্বরূপ। তাই অসঙ্গ তৃতীয় প্রকার জ্ঞানের ব্যাখ্যাতে এইসব ক্লেশের আবরণ থেকে জ্ঞানকে বিশুদ্ধিকরণের কথা বলেছেন।

আচার্য জগতের ব্যাখ্যায় যে চতুর্থ প্রকার জ্ঞানের কথা বলেছেন তা হল জ্ঞেয়াবরণবিশুদ্ধিজ্ঞানগোচর। মহাযান বা বোধিসত্ত্বযানে এই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হয়। বাহ্য বিষয়ে সত্তা বিষয়ক জ্ঞান হল জ্ঞেয়াবরণ। আসলে ক্লেশ হল কোন বিষয়ের প্রতি ভালো লাগা বা খারাপ লাগা। কোন বিষয়ের প্রতি এই যে অনুরাগ তাতে দুটি বিষয় থাকে, প্রথমত আমি, দ্বিতীয়ত বস্তু অর্থাৎ যাকে ভালো লাগে বা খারাপ লাগে। এখানে সম্পূর্ণ ঘটনাটা সংঘটিত হয় কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অথবা বস্তুকে কেন্দ্র করে। আমরা যেমন পঞ্চস্কন্ধের বাইরে 'আত্মা' বলে একটা সত্তাকে স্বীকার করি, যাকে আমি বলি; সেভাবে বালি, ইট ইত্যাদির বাইরে 'বাড়ি' বলে একটা বস্তুকে স্বীকার করি, যার প্রতি আমাদের আকর্ষণ, বিকর্ষন বা ঘৃণা থাকে। এই আকর্ষণ বা ঘৃণাকে দূর করার জন্য কেবল ঐ আত্মার ধারণা চলে গেলে হবে না, ঐ জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকেও অবগত হতে হবে। তাই কেবলমাত্র অহং বা আত্মার ধারণা চলে গেলেই ক্লেশের ধারণার নাশ হয় না, ক্লেশের নাশের জন্য ঐ বস্তুগুলোর প্রকৃত

স্বরূপকে জানতে হবে। জগতের কোন বস্তুর সত্তা নেই, প্রত্যেকটি বস্তু হল নিঃস্বভাব অর্থাৎ শূন্য। আমাদের জ্ঞান সর্বদা জ্ঞেয় বস্তুর উপর আবরণ তৈরী করে, ফলে বস্তুর প্রকৃত স্বভাব আমরা জানতে পারি না। যখন ঐ আবরণ দূরীভূত হবে তখন প্রকৃত জ্ঞানকে আমরা জানতে পারব। মহাযানী মতে, আমাদের মূল লক্ষ্য হল বিশুদ্ধিজ্ঞান এবং এমন বিশুদ্ধি জ্ঞান যে জ্ঞানে জ্ঞেয় বলে কিছু থাকবে না। পরবর্তীকালে ধর্মকীর্তি, দিঙনাগ এই জ্ঞানকে স্বসংবেদন বলেন, যেখানে জ্ঞান নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে।

মহাযানী মতে, ধর্ম নৈরাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ দূরীভূত হয়। ধর্ম বলতে বৈশেষিক সম্প্রদায় যেভাবে ধর্ম-ধর্মী সম্বন্ধের কথা বলেছেন সেই অর্থে নয়, ধর্ম বলতে এখানে যা স্বলক্ষণ পদার্থকে ধারণ করে তাকে বোঝানো হয়েছে। ধর্ম বলতে বৌদ্ধদর্শনে ঘটপটাদি সংস্কৃত পদার্থ এবং অসংস্কৃত পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এই সব পদার্থ বাহ্যজগতে বিদ্যমান আছে এবং তা সৎ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব বস্তুর বা পদার্থের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ফলে নৈরাত্ম্য শব্দের দ্বারা একদিকে যেমন আত্মাকে অস্বীকার করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধদর্শনে দ্রব্যকেও অস্বীকার করা হয়েছে। তাই বাহ্যবস্তুতে যে বিশ্বাস তা হল জ্ঞেয়াবরণ, কারণ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে বলে। এই ধর্মনৈরাত্ম্যের বোধই আমাদের সর্বজ্ঞতার বোধের দিকে নিয়ে যাবে। তাই বাহ্যবস্তুর সত্তা বিষয়ক জ্ঞান হল ক্লেশাবরণ, আর জ্ঞেয়াবরণ হল ঐ ক্লেশ বিষয়ে যে মিথ্যা ধারণা। ফলে বস্তু বিষয়ে জ্ঞানের অপসরণের জন্য ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞানের প্রয়োজন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পুদগল নৈরাত্ম্য ক্লেশাবরণ দূর করে এবং ধর্ম নৈরাত্ম্যের দ্বারা জ্ঞেয়াবরণ দূরীভূত হয়। আর শ্রাবকযানে কেবলমাত্র ক্লেশাবরণ নাশের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাযানীরা মনে করেন, শুধু ক্লেশের দূর করে সব কিছুর দূরীকরণ সম্ভব নয়। আমাদের দৃষ্টিকেও পরিবর্তিত করতে হবে। এই দৃষ্টিকে পরিবর্তনের জন্য বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞান থাকার জন্য এই ক্লেশে আমরা উপনীত হই। অর্থাৎ আমাদের দুঃখ কষ্টের মূলে অবস্থান করছে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সুতরাং যদি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারি তাহলেই এই দুঃখ কষ্ট থেকে চিরতরে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তাহলে ক্লেশাবরণকে দূর করাই মূল বিষয় নয়, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে জানাই মূল বিষয়। তাই জ্ঞেয়াবরণকে দূর করাই প্রধান লক্ষ্য। তাই মহাযানীরা ক্লেশাবরণের থেকে অধিকতরভাবে জ্ঞেয়াবরণ নাশের কথা বলেন।

তাছাড়া *বোধিসত্ত্বভূমির* সপ্তম অধ্যায় *বোধি পটলে* 'বোধি' বলতে কি বোঝায় বলতে গিয়েও এই ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ প্রহাণ বা বর্জনের কথা বলা হয়েছে। এখানে তাই বলা হয়েছে ক্লেশাবরণ মুক্ত যে জ্ঞান তা নির্মল এবং সর্বক্লেশনিরনুবন্ধ জ্ঞান। আর জ্ঞেয়াবরণ বর্জিত হলে অনাবৃত, শুদ্ধ এবং অসঙ্গ জ্ঞান লাভ হয় এবং তা থেকে অনুত্তরাসম্যগসম্বোধির প্রাপ্তি ঘটে[10]।

৮

[10] *Bodhisattvabhūmi: Being the XVth Section of Asaṇgapāda's Yogācārabhūmi,* ed. By Nalinaksha Dutt, K.P. Jasyaswal Research Institute, Patna, 1966.

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

বোধিসত্ত্ব-দের শিক্ষণীয় জ্ঞানের মাহাত্ম্য

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দৃষ্টিকোন থেকে এভাবে বলা যায় যে, অসঙ্গ বোধিসত্ত্বদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে সব দিক নির্দেশ করেছেন, সেই আলোচনাতে শুধু বোধিসত্ত্বদের জ্ঞানই প্রাধান্য পায়নি; সাধারণ মানুষের জাগতিক জ্ঞানের বিষয়ও প্রাধান্য লাভ করেছে। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে কোন জ্ঞান তখনই গৃহীত হবে যখন তারা সেই জ্ঞানকে জানতে পারবেন। তাই বোধিসত্ত্বদের জ্ঞান তথা বুদ্ধ উপদেশ সাধারণ মানুষের কাছে উপযোগী করে তোলার জন্য সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সমতুল্য করেই উপস্থাপিত করতে হবে। অসঙ্গ *তত্ত্বার্থ পটলে* জাগতিক জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই প্রথমেই সাধারণ মানুষের জ্ঞানের কথা বলেছেন। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে যদি কোন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে তাদের অনুকূল করেই তুলে ধরতে হবে। আর সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রতিষ্ঠা পেলে সেই তত্ত্ব তথা বুদ্ধ উপদেশাবলী তথা বোধিসত্ত্ব জ্ঞানের যথার্থতা প্রতিপাদিত হবে।

তাছাড়া অসঙ্গ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষ কিভাবে আদর্শ পুরুষ হতে পারে, কিংবা বোধিসত্ত্ব কিভাবে সম্যগ্ সম্বুদ্ধ বা উত্তম পুরুষ হতে পারে – তার দিকে আলোকপাত করেছেন। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জগতের সকল মানুষ ক্রমে ক্রমে কিভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে তার কথাও উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা একজন সাধারণ মানুষও তার বিভিন্ন অবস্থায় থেকে এইসব মানসিক স্থিতি তথা গুণাবলীর উন্নতি সাধন ঘটিয়ে ঐ উত্তম পুরুষে পরিণত হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী(Bibliography)

১। Asaṅga, *Abhidharmasamuccaya,* Prahlad Pradhan(ed), Visva-Bharati, Santiniketan, 1950.
২। Asaṅga, *Bodhisattvabhūmi: Being the XVth Section of Asaṅgapāda's Yogācārabhūmi,* Nalinaksha Dutta(ed), K.P. Jayaswal Research Institute, Patna, 1966.
৩। Asaṅga, *Śrāvakabhūmi of Ācārya Asanga,* Part ii, Karunesh Shukla(ed), K.P. Jayaswal Research Institute, Patna, 1991.
৪। Walpola Rahula, *Abhidharmasamuccaya: The Compendium of the Higher Teaching (Philosophy) by Asaṁga,* English version from the French by Sara Boin-Webb, Asian Humanities Press, Fremont, California, 2001.
৫। *Abhidharmasamuccaya - Bhāṣyam,* Tibetan Sanskrit Works Series No. 17, Anantalal Thakur(ed), K.P. Jayaswal Research Institute, Patna.
৬। Janice Dean Wills, *On Knowing Reality, The Tattvārtha Chapter of Asaṅga's Bodhisattvabhūmi,* Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2002.
৭। Asaṅga, The *Tattvārtha* Chapter of the *Yogacāra-bhūm,* Fok Tan Mei Ling(trans), University of Hong Kong, August 2014.
৮। Alex Wayman, *Analysis of the Śrāvakabhūmi Manuscript,* University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1961.

৯। Alex Wayman, *AMillennium of Buddhist Logic,* Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi.

১০। *The Yogācārabhūmi of Ācārya Asaṅga,* Vidhushekhara Bhattacharya(ed), Part-1, University of Calcutta, 1957.

১১। আর্য অসঙ্গ বিরচিত : আচার্য নরেন্দ্রদেবকৃত-সংক্ষিপ্ত হিন্দীরূপান্তরসহিত:, অনেকবিধসূচী-পাঠান্তরাদিসংকলিত:, স্বামী দ্বারিকাদাসশাস্ত্রী সম্পাদিত, *মহাযানসূত্রালংকার,* বৌদ্ধভারতী, P.O.- বারাণসী-১, ১০৪৯।

১২। মুখোপাধ্যায় সুজিতকুমার, *শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার,* চীন ভবন, বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা ।

১৩। শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ও মহাস্থবির শ্রীমৎ জ্যোতিপাল সম্পাদক ও অনুবাদক, *বোধিচর্য্যাবতার,* মহাবোধি বুক এজেন্সি, ৪-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা – ৭০০০৭৩।